সিয়াম, তারাবীহ ও যাকাত বিষয়ে কয়েকটি অধ্যায়

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-উসাইমীন রহ.

৯০০৪

অনুবাদ: সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

فصول في الصيام والتراويح والزكاة

الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله

ترجمة: ثناء الله نذير أحمد

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

IslamHouse.com

সূচীপত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা, আমরা তার প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট ইস্তেগফার করি এবং তাঁর নিকট তাওবা করি। আমরা আমাদের নফসের কু-প্রবৃত্তি ও আমাদের আমলের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। তিনি যাকে হিদায়াত করেন তার কোনো গোমরাহকারী নেই, তিনি যাকে গোমরাহ করেন তার কোনো হিদায়াতকারী নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক তার কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন তার ওপর, তার পরিবারের ওপর, তার সাথীদের ওপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত সঠিকভাবে যারা তাদের অনুসরণ করবে তাদের সকলের ওপর।

অতঃপর.....

বরকতময় মাস রমযানের আগমন উপলক্ষে মুসলিম ভাইদের নিকট সিয়াম, তারাবীহ ও যাকাত বিষয়ে নিম্নের অধ্যায়গুলো পেশ করছি। আল্লাহ আমাদের এ আমলকে একমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করুন, তাঁর শরী'আত মোতাবেক বানিয়ে দিন ও মানব জাতির উপকারী করুন। তিনি দো'আ কবুলকারী ও অনুগ্রহশীল।

প্রথম অধ্যায়: সিয়ামের হুকুম প্রসঙ্গে

রমযানের সাওম ফরয। এর ফরযিয়্যাত আল্লাহর কিতাব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও মুসলিমদের ইজমা‘ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٤ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥﴾ [سورة البقرة: 183-185]

“হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদয়া- একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা। অতএব, যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান। রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার

জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৩-৮৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان». متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «وصوم رمضان، وحج البيت».

“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বস্তুর ওপর রাখা হয়েছে: (১) সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল (২) সালাত কায়েম করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) বায়তুল্লাহ শরীফের হজ করা ও (৫) রমযানের সাওম পালন করা”।[1]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে:

«وصوم رمضان، وحج البيت»

“এবং রমযানের সাওম ও বায়তুল্লাহ শরীফের হজ”।[2]

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬।

রমযানের সাওমের ফরযিয়্যাত সম্পর্কে সকল মুসলিম একমত। রমযানের সাওমের ফরযিয়্যাত যে অস্বীকার করবে, সে মুরতাদ ও কাফির। অতঃপর সে যদি তাওবা করে ও এর ফরযিয়্যাত মেনে নেয়, তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে, অন্যথায় তাকে কাফির হিসেবে হত্যা করা হবে।

হিজরতের দ্বিতীয় বছর মুসলিম উম্মাহর ওপর সাওম ফরয হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয়টি রমযান মাসের সাওম পালন করেছেন। প্রত্যেক সাবালক ও বিবেকবান মুসলিমের ওপর সাওম ফরয।

কাফেরদের ওপর সাওম ওয়াজিব নয়, ইসলাম ব্যতীত তাদের সাওম গ্রহণযোগ্য নয়। সাবালক হওয়ার পূর্বে বাচ্চাদের ওপর সাওম ফরয নয়। পনের বছর পূর্ণ হলে অথবা নাভির নিচে পশম গজালে অথবা স্বপ্নদোষ ইত্যাদির মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটলে বাচ্চারা সাবালক হয়। নারীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে ঋতু বা হায়েস আসা। এসব আলামতের যে কোনো একটি

দ্বারা তাদের সাবালক হওয়া সাব্যস্ত হবে। হ্যাঁ, অভ্যাস গড়ার জন্য বাচ্চাদের সাওমের নির্দেশ দেবে, যদি এতে তাদের কষ্ট না হয়। পাগল বা মস্তিষ্ক বিকৃতদের ওপর সাওম ওয়াজিব নয়। বড় হওয়ার পরও যদি কোনো বাচ্চা প্রলাপ বকে, ভালো-মন্দ যাচাই করতে অক্ষম হয়, তাহলে তার ওপর সিয়াম ফরয হবে না এবং তার পক্ষ থেকে কাফ্ফারাস্বরূপ খাদ্য দিতে হবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সিয়ামের হিকমত ও ফায়দা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা‘আলার এক নাম হচ্ছে “হাকীম” তথা হিকমতপূর্ণ। যার মধ্যে হিকমত রয়েছে, তাকেই হাকীম বলা হয়। হিকমতের দাবি হচ্ছে প্রতিটি বস্তু সঠিক স্থানে স্থাপন করা ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা। অতএব, আল্লাহ তা‘আলার এ নামের দাবি হচ্ছে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন অথবা তিনি যেসব বিধান রচনা করেছেন, তা পরিপূর্ণভাবে হিকমতপূর্ণ। যে জানল সে তো জানল, আর যে জানল না সে অজ্ঞ থাকল। নিম্নে সিয়ামের কতক হিকমত ও উপকারিতা পেশ করা হলো:

- **সিয়ামের হিকমত:** সিয়াম একটি ইবাদত, বান্দা সাওমের মাধ্যমে নিজের স্বভাবজাত বস্তু ও অভ্যাস যেমন পানাহার ও সহবাস ত্যাগ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, তার সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের আশায়। (বান্দা যদি পানাহার ত্যাগ করে সাওম পালন করে, তবে) এর দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহর পছন্দ ও আখিরাত তার নিকট

তার নিজের পছন্দ ও দুনিয়ার চেয়ে অধিক প্রিয় ও অগ্রাধিকারযোগ্য।

- **সিয়ামের হিকমত:** বান্দা যদি যথাযথভাবে সিয়াম পালনে সচেষ্ট হয়, তাহলে সে তাকওয়া অর্জন করে ধন্য হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾ [سورة البقرة: 183]

"হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর"। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৩]

সিয়ামের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করা, অর্থাৎ তার নির্দেশ পালন করা ও তার নিষেধ থেকে বিরত থাকা। সাওম দ্বারা সিয়াম পালনকারীকে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত

রেখে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَن لم يَدَعْ قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامه وشرابه». رواه البخاري

“যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা মোতাবেক আমল ও মূর্খতা ত্যাগ করতে পারল না, তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই”।[3]

মিথ্যা কথা: অর্থাৎ প্রত্যেক হারাম কথা, যেমন মিথ্যা, গিবত, গালি ও অন্যান্য হারাম বাক্যালাপ।

মিথ্যা কথা মোতাবেক আমল: অর্থাৎ প্রত্যেক হারাম কর্ম, যেমন মানুষের ওপর যুলুম করা, খিয়ানত করা, ধোঁকা দেওয়া, প্রহার করা ও তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা ইত্যাদি, অনুরূপ হারাম গান-বাদ্য ও মিউজিক শ্রবণ করা।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০৩।

মূর্খতা: বেকুবি এবং কথা ও কর্মে শালীনতা পরিহার করা। যদি সাওম পালনকারী এ আয়াত ও হাদীস অনুযায়ী আমল করে, তাহলে তার সাওম হবে আত্মশুদ্ধিমূলক, চরিত্র গঠনকারী ও তার জন্য সঠিক পথের দিশারী। রমযান তার চরিত্র, স্বভাব ও নফসের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

- **সিয়ামের অন্য হিকমত:** সাওমের ফলে বিত্তবানরা তাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামতের মূল্য বুঝতে পারেন, যেমন আল্লাহ তাদেরকে তাদের চাহিদা মোতাবেক পানাহার ও বিবাহের সুযোগ দান করেছেন। তারা আল্লাহর এ নি'আমতের শোকর আদায় করে তাদের গরীব ভাইদের কথা স্মরণ করবে, যারা তাদের ন্যায় চাহিদা পূরণ ও বিবাহে সক্ষম নয়, তাদের ওপর তারা দান ও অনুগ্রহের হাত বাড়িয়ে দেবে।
- **সিয়ামের অন্য হিকমত:** প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও তার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অনুশীলন করা। কারণ, নফসের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ এতেই

নিহিত। সিয়াম পালনকারী সাওমের মাধ্যমে নিজেকে পশুবৎ স্বভাব থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়।

- **সিয়ামের হিকমত:** কম খানা-পিনার ফলে পাকস্থলী কিছু সময়ের জন্য অবসর গ্রহণ করে, যা শরীরের ক্ষতিকর ও বিষাক্ত পদার্থ বের হওয়ার জন্য সহায়ক।

তৃতীয় অধ্যায়: মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তিদের সাওম প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ ١٨٥﴾ [سورة البقرة : 185]

“আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]

অসুস্থতা দু’প্রকার:

এক. যদি অসুস্থতা এমন হয় যে, যা থেকে সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। যেমন, ক্যান্সার, তাহলে এরূপ রোগীর ওপর সাওম জরুরি নয়। কারণ, তার ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক যে, সে কখনো সাওম পালনে সক্ষম হবে না, তাই সে প্রত্যেক সাওমের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্য দেবে। সাওমের সংখ্যানুপাতে

মিসকিনদের জমা করে দুপুর অথবা রাতের খাবার দেবে যেমন, আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বার্ধক্যে করতেন অথবা সাওমের সংখ্যা হিসেবে মিসকিনদের পৃথক পৃথক খাদ্য দেবে। প্রত্যেক মিসকিনকে হাফ কিলু দশ গ্রাম গম/চাল দেবে। এর সাথে তরকারী হিসেবে গোস্ত অথবা তেল দেওয়া ভালো। সাওম পালনে বৃদ্ধ অক্ষম ব্যক্তিও অনুরূপ করবে।

দুই. সাময়িক অসুস্থতা, যা থেকে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা বেশি যেমন জ্বর ও অনুরূপ অসুস্থতা। এর তিন অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: সাওম যদি তার জন্য ক্ষতিকর ও কষ্টকর না হয়, তাহলে তার ওপর সাওম ওয়াজিব, যেহেতু তার কোনো ওযর নেই।

দ্বিতীয় অবস্থা: সাওম তার জন্য কষ্টকর, কিন্তু ক্ষতিকর নয়, এমতাবস্থায় তার জন্য সাওম মাকরূহ। কারণ, এতে আল্লাহর রোখসত ত্যাগ করে নিজের ওপর কষ্টের বোঝা চাপানো বৈ কিছু নয়।

তৃতীয় অবস্থা: সাওম যদি ক্ষতিকর হয়, তাহলে তার জন্য সাওম হারাম। কারণ, এর ফলে নিজের ওপর বিপদ ডেকে আনা বৈ কিছু নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩﴾ [سورة النساء: 29]

“আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৯]

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ ١٩٥﴾ [سورة البقرة: 195]

“এবং নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৫]

হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ»

"ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত করাও যাবে না"।[4]

ইমাম নববী রহ. বলেছেন: এ হাদীসের কয়েকটি সনদ রয়েছে, যার একটি অপরটি দ্বারা শক্তিশালী হয়।

রোগীর ওপর সাওম ক্ষতিকর কি-না তা রোগীর অনুভূতি অথবা নির্ভর যোগ্য ডাক্তারের পরামর্শ থেকে বুঝা যাবে। এ অবস্থায় যদি রোগী সাওম ভঙ্গ করে, তাহলে সুস্থ হওয়ার পর অনুরূপ সংখ্যা ক্বাযা করবে। আর যদি সুস্থ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাহলে মৃত্যুর কারণে তার থেকে সাওম মওকুফ হয়ে যাবে। কারণ, তার ওপর পরবর্তীতে যে দিনে সাওম ফরয ছিল, সে দিনগুলো সে পায় নি।

আর মুসাফির দু'প্রকার:

---

[4] সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৩৪১; মুসনাদে আহমদ: (৫/৩২৭); মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস নং ২৩৪৫। হাকেম হাদীসটি মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী তার সমর্থন করেছেন।

এক. যদি কেউ রমযানের সাওম না রাখার জন্য বাহানা হিসেবে সফর আরম্ভ করে, তার সাওম ভঙ্গ করা বৈধ হবে না। কারণ, বাহানার ফলে আল্লাহর ফরয রহিত বা মওকুফ হয় না।

দুই. সত্যিকার অর্থে মুসাফির। এর তিন অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: সাওম যদি তার ওপর খুব কষ্টকর হয়, তাহলে তার জন্য সাওম হারাম। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতহে মক্কার সময় সাওম অবস্থায় ছিলেন, তার নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, মানুষের নিকট সিয়াম খুব কষ্টকর হচ্ছে, তারা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। তিনি আসরের পর পানির পাত্র ডেকে আনলেন, অতঃপর পান করলেন, সবাই তাকে দেখতে ছিল। তাকে বলা হলো: কতক লোক সাওম অবস্থায় আছে। তিনি বললেন: "তারা পাপী, তারা পাপী"।[5]

দ্বিতীয় অবস্থা: সাওম তার জন্য কষ্টকর, তবে বেশি কষ্টকর নয়। এমতাবস্থায় তার জন্য সাওম মাকরূহ।

---

[5] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১১৪)

কারণ, এর দ্বারা নিজের ওপর কষ্ট চাপিয়ে আল্লাহর শিথিলতা ত্যাগ করা হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ ١٨٥﴾ [سورة البقرة: 185]

“আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]

এখানে আল্লাহর ইচ্ছার অর্থ মহব্বত। যদি সাওম রাখা না-রাখা উভয় সমান হয়, তাহলে সাওম রাখাই উত্তম। কারণ, এটা ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল।

সহীহ মুসলিমে আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعبدالله بن رواحة»

“আমরা কঠিন গরমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হয়ে, প্রখর রৌদ্রের কারণে এক সময় আমরা নিজেদের হাত মাথায় ধরে ছিলাম। আমাদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ব্যতীত কেউ সাওম অবস্থায় ছিল না”।[6]

নিজ শহর থেকে সফর আরম্ভকারী মুসাফির ফিরে আসা পর্যন্ত সফরে থাকে। সফরের দেশে যদিও তার অবস্থান দীর্ঘ ও লম্বা হয়, যদি তার নিয়ত থাকে যে, সফরের উদ্দেশ্য হাসিল হলেই দেশে ফিরবে। এমতাবস্থায় সে সফরের রোখসত গ্রহণ করবে, তার অবস্থান যত দীর্ঘ হোক। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর সমাপ্তির নির্দিষ্ট কোনো সময় বর্ণনা করেন নি। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত সফর ও সফরের বিধান শেষ হওয়ার দলিল কায়েম না হবে, সে সফর অবস্থায় থাকবে।

---

[6] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১২২।

সাময়িক সফর ও ধারাবাহিক সফরে কোনো পার্থক্য নেই। সাময়িক সফর যেমন হজ, উমরাহ ও নিকটাত্মীয়দের দেখার জন্য সফর। ধারাবাহিক সফর যেমন ভাড়া গাড়ি ও অন্যান্য বড় গাড়ির চালক ও হেলপারগণের সফর। তারা যখন শহর ত্যাগ করবে, তখন থেকে তাদের জন্য মুসাফিরের বিধান আরম্ভ হবে, যেমন রমযানে পানাহার করা, চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতকে দু'রাকাত আদায় করা এবং প্রয়োজন হলে যোহর-আসর ও মাগরিব-এশা একত্র আদায় করা। তাদের জন্য সাওম না রেখে পানাহার করা উত্তম। কারণ, তারা শীতের দিনে এসব সাওম ক্বাযা করতে সক্ষম। তারা যখন নিজ দেশে অবস্থান করে, তখন তারা মুকিম, মুকিমদের সুবিধা-অসুবিধা তারা ভোগ করবে। আর যখন তারা সফরে থাকে, তখন তারা মুসাফির, মুসাফিরদের সুবিধা-অসুবিধা তারা ভোগ করবে।

চতুর্থ অধ্যায়: সাওম ভঙ্গের কারণ, প্রসঙ্গে

সওম ভঙ্গের কারণ, ৭টি:

১. স্ত্রী সহবাস, অর্থাৎ পুরুষের পুরুষাঙ্গ স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করানো। সাওম পালনকারীর সহবাসের ফলে সাওম ভঙ্গ হয়। অতঃপর সে যদি সাওম ওয়াজিব অবস্থায় রমযানের দিনে সহবাস করে, তাহলে তার ওপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, তার কঠিন অপরাধের কারণে। কাফ্ফারা হচ্ছে গোলাম আযাদ করা, যদি তা না পাওয়া যায় তাহলে লাগাতার দু'মাস সাওম পালন করা, যদি সামর্থ না থাকে তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য দান করা। আর যদি সহবাসকারীর ওপর সাওম ওয়াজিব না থাকে, যেমন মুসাফির, তাহলে তার ওপর ক্বাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা নয়।

২. সাওম অবস্থায় স্পর্শ বা চুম্বন ইত্যাদি দ্বারা বীর্যপাত ঘটানো, যদি চুম্বনের ফলে বীর্য বের না হয়, তাহলে তার ওপর কিছু ওয়াজিব হবে না।

৩. পানাহার করা, অর্থাৎ মুখ অথবা নাক দ্বারা পানীয় অথবা খাদ্য জাতীয় কিছু পেটে স্থানান্তর করা। সাওম পালনকারীর জন্য ঘ্রাণ জাতীয় ধোঁয়া পেটে নেওয়া বা গলধঃকরণ করা (ধুমপান) বৈধ নয়। কারণ, ধোঁয়ার শরীর আছে, তবে সুঘ্রাণ জাতীয় দ্রব্য শুঁকলে (গলধঃকরণ না করলে) সমস্যা নেই।

৪. খাদ্যানুরূপ কিছু গ্রহণ করা। যেমন, খাদ্য জাতীয় ইনজেকশন নেওয়া। যদি ইনজেকশন খাদ্য জাতীয় না হয়, তবে সাওম ভাঙ্গবে না, রগে বা গোশতে যেখানেই তা প্রয়োগ করা হোক।

৫. শিঙ্গা লাগানো বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে শিঙ্গার পরিমাণ রক্ত বের করা, যে কারণে শরীর দুর্বল হয়। হ্যাঁ যদি পরীক্ষার জন্য সামান্য রক্ত নেয়া হয়, তাহলে সাওম ভঙ্গ হবে না। কারণ, এ জন্য শরীর দুর্বল হয় না, যেমন দুর্বল হয় শিঙ্গা লাগানোর ফলে।

৬. ইচ্ছাকৃত বমি করা, অর্থাৎ পেট থেকে খানা অথবা পানীয় জাতীয় কিছু বের করা।

৭. নারীদের মাসিক ঋতু ও সন্তান প্রসব জনিত কারণে রক্তস্রাব।

তিনটি শর্তে এসব (সাতটি) কারণে সাওম ভঙ্গ হবে:

ক. সাওম ভঙ্গের হুকুম ও সাওমের সময় সম্পর্কে জানা থাকা।

খ. সাওম স্মরণ থাকা।

গ. স্বেচ্ছায় এসব কর্ম সম্পাদন করা। যেমন, শিঙ্গার কারণে সাওম ভাঙ্গবে না ভেবে কেউ শিঙ্গা লাগাল, তাহলে তার সাওম বিশুদ্ধ। কারণ, সে শিঙ্গার হুকুম সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ ٥﴾ [سورة الأحزاب: 5]

“আর এ বিষয়ে তোমরা কোনো ভুল করলে তোমাদের কোনো পাপ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে (পাপ হবে)”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫]

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ ٢٨٦﴾ [سورة البقرة: 286]

“হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]

আল্লাহ তা‘আলা এর উত্তরে বলেছেন: “আমি কবুল করলাম”। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত, আদি ইবন হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু সাদা-কালো দু’টি কালো দাগা বালিশের নিচে রেখে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খেতে ছিলেন, যখন একটি অপরটি থেকে পৃথক ও স্পষ্ট দেখা গেল, তিনি পানাহার থেকে বিরত থাকলেন। কারণ, তিনি মনে করেছেন এটাই আল্লাহর নিম্নের বাণীর অর্থ:

﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ ١٨٧﴾ [سورة البقرة: 187]

“আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৭]

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: “এর অর্থ হচ্ছে দিনের সাদা আভা ও রাতের কালো অন্ধকার”।[7] তিনি তাকে সে দিনের সাওমের ক্বাযা করতে বলেন নি।

যদি ফজর উদিত হয় নি অথবা সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে ভেবে পানাহার করে অতঃপর তার বিপরীত প্রকাশ পায়, তাহলে তার সাওম বিশুদ্ধ। কারণ, সময় সম্পর্কে তার জানা ছিল না। সহীহ বুখারীতে আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একদা মেঘলা দিনে আমরা ইফতার করি, অতঃপর সূর্য উদিত হয়।[8] এমতাবস্থায় যদি ক্বাযা ওয়াজিব হত, তাহলে নবী

---

[7] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯১৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৯০।

[8] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৫৯।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বর্ণনা করতেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে দীনের পূর্ণতা দান করেছেন। আর তিনি যদি বর্ণনা করতেন, তাহলে অবশ্যই সাহাবায়ে কেরাম তা পৌঁছাতেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা দীন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন নি, তাই আমরা জানলাম এটা ওয়াজিব নয়। কারণ, এমন কিছু ঘটলে তা বর্ণনা করতে সাহাবায়ে কিরামের প্রচেষ্টার অভাব হতো না। সুতরাং এ ধরনের একটি জরুরি বিষয় সবার পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। আর যদি কেউ ভুলে পানাহার করে, তাহলে তার সাওম ভঙ্গ হবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»

"সওম অবস্থায় যে ভুলে পানাহার করল, সে যেন তার সাওম পূর্ণ করে। কারণ, আল্লাহ তাকে পানাহার করিয়েছেন"।[9]

যদি কাউকে জোরপূর্বক পানাহার করানো হয় অথবা কুলি করার সময় তা পেটে চলে গেল অথবা চোখে ঔষুধ দেওয়ার পর তা পেটে চলে যায় অথবা স্বপ্নদোষের ফলে বীর্য বের হয়ে যায়, তাহলে সাওম বিশুদ্ধ। কারণ, এখানে তার ইচ্ছার কোনো দখল নেই।

মিসওয়াকের ফলে সাওম ভঙ্গ হবে না, বরং দিনের শুরুতে অথবা দিনের শেষে সাওম পালনকারী ও সাওমহীন সবার জন্য মিসওয়াক করা সুন্নাত। সাওম পালনকারী গরম অথবা পিপাসা লাঘবের জন্য পানি ব্যবহার করতে পারবে। "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওম অবস্থায় গরমের কারণে মাথায় পানি দিতেন"।[10]

---

[9] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৩৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫৫।

[10] আবু দাউদ, হাদীস নং ২৩৬৫।

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সাওম অবস্থায় কাপড় ভিজিয়ে শরীরের রেখে ছিলেন।[11] এভাবে আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করেন।

---

[11] ইমাম বুখারী সাওম অধ্যায়ের হাদীসের পূর্বে অধ্যায়ের ভূমিকাতে সনদবিহীন এটাকে উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়: তারাবীহ প্রসঙ্গে

তারাবীহ: রমযানের রাতে জামা‘আতের সাথে সালাত আদায় করা। এর সময় হচ্ছে এশার পর থেকে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সালাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন:

«من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»

“রমযানে যে ঈমান ও সাওয়াবের আশায় কিয়াম করল, আল্লাহ তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন”।[12]

সহীহ বুখারীতে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক রাতে মসজিদে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন, লোকেরাও তার সাথে সালাত আদায় করে। অতঃপর পরবর্তী রাতে সালাত আদায় করেন, মানুষের আধিক্য খুব বেড়ে যায়। অতঃপর তারা তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাতে একত্র হয়, কিন্তু

---

[12] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০০৯।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের জন্য তাদের নিকট আসলেন না, যখন সকাল হলো তিনি বললেন: “তোমরা যা করেছে আমি তা দেখেছি, তোমাদের নিকট আমার না আসার কারণ এ সালাত তোমাদের ওপর ফরয হওয়ার আশঙ্কা।[13] এ ঘটনা রমযানের।

সুন্নাত হচ্ছে এগার রাকাত পড়া, প্রত্যেক দু'রাকাতের পর সালাম ফিরানো। কারণ, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রমযানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত কী রকম ছিল? তিনি বললেন:

«ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة»

“তিনি রমযান ও গায়রে রমযান কখনো এগার রাকাতের চেয়ে বেশি পড়তেন না”।[14]

---

[13] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০১২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬১।

[14] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬৪।

মুয়াত্তা গ্রন্থে রয়েছে: সায়েব ইবন ইয়াজিদ সাহাবী বলেন, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবন কা'ব ও তামিমুদ দারি রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে মানুষের সাথে এগার রাকাত পড়ার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন।[15]

এগার রাকাতের অধিক পড়লেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বললেন: "দুই রাকাত দুই রাকাত, যখন তোমাদের কেউ ফজর হওয়ার আশঙ্কা করে, এক রাকাত পড়ে নিবে, যা তার পূর্বের সকল সালাতকে বেজোড় করে দেবে।[16] হাদীসে বর্ণিত এগারো রাকাত দীর্ঘ ও লম্বা করা, যেন মানুষের কষ্ট না হয়, এটা উত্তম ও পরিপূর্ণ পন্থা।

কতক হাফেয সাহেব খুব দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত করেন যা সঠিক নয়। এ কারণে যদি সালাতের কোনো

[15] ময়াত্তা ইমাম মালেক: (১/১১০), হাদীস নং ২৮০।

[16] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৪৯।

ওয়াজিব নষ্ট হয় অথবা কোনো রোকন নষ্ট হয়, তাহলে সালাত শুদ্ধ হবে না।

অনেক ইমামদের দেখা যায়, তারা সালাতে ধীর-স্থিরতা রক্ষা করেন না, এটা তাদের বড় ভুল। কারণ, ইমাম শুধু নিজের জন্য সালাত আদায় করে না, বরং সে নিজের ও অপরের জন্যও সালাত আদায় করে। ইমাম মূলতঃ জিম্মাদার, তাই উত্তমপন্থায় তার কার্য সম্পাদন করা জরুরি। আলিমগণ বলেছেন: ইমামের এতটা দ্রুত করা মাকরূহ, যে সময়ে মুক্তাদিগণ সালাতের জরুরি কার্য সম্পাদান অক্ষম।

সকলের ওপর উচিৎ তারাবীহর সালাত আদায় করা। এক মসজিদ থেকে অন্য মসজিদে গিয়ে (সুন্দর কিরাত শোনার আশায়) সময় নষ্ট না করে ইবাদতে মশগুল থাকা। কারণ, ইমামের সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাতে মশগুল থাকবে, সে রাত জাগরণের সাওয়াব অর্জন করবে, যদিও সে ইমামের সাথে সালাত শেষে বাকী সময় বিছানায় শুয়ে থাকে।

তারাবীহর সালাতে নারীদের শরীক হতে কোনো সমস্যা নেই, যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে, তবে শর্ত হচ্ছে শালীনভাবে, সৌন্দর্য প্রকাশ না করে ও সুগন্ধি ব্যবহার না করে তারা মসজিদে আসবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: যাকাত ও যাকাতের উপকারিতা প্রসঙ্গে

যাকাত ইসলামের পাঁচটি ফরযের একটি। কালেমায়ে শাহাদাত ও সালাতের পর যাকাতের স্থান। কুরআন-হাদীস ও মুসলিমের ইজমা‘ দ্বারা এর ফরযিয়্যাত প্রমাণিত। যাকাতের ফরযিয়্যাত অস্বীকারকারী কাফির ও ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত মুরতাদ। তাকে তাওবার জন্য বলা হবে, যদি তাওবা করে গ্রহণ করা হবে, অন্যথায় তাকে হত্যা করা। আর যাকাতের ব্যাপারে যে কৃপণতা করল অথবা কম আদায় করল সে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত ও আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١٨٠﴾ [سورة آل عمران:180]

“আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের

জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা আমল কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮০]

সহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন, অতঃপর সে তার যাকাত প্রদান করল না, কিয়ামতের দিন তার জন্য বিষধর সাপ সৃষ্টি করা হবে, যার দু'টি চোঁয়াল থাকবে, যা দ্বারা সে তাকে কিয়ামতের দিন পেঁছিয়ে ধরবে, অতঃপর তার দু'চোয়াল পাকড়ে বলবে: আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন”।[17]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[17] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৪০৩।

﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥﴾ [سورة التوبة: 34، 35]

"এবং যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেওয়া হবে। (আর বলা হবে) 'এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৪-৩৫]

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدِّي منها حقَّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم

فيكوى بها جنبهُ وجبينه وظهرهُ كلما بردت أُعيدت في يوم كان مقدارهُ خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد»

"স্বর্ণ ও রূপার এমন কোনো মালিক নেই, যে এর হক প্রদান করে না, যার জন্য কিয়ামতের দিন আগুনের পাত তৈরি করা হবে না, যা জাহান্নামের আগুনে তাপ দিয়ে অতঃপর তার পার্শ্ব, কপাল ও পৃষ্ঠদেশ সেক দেওয়া হবে। যখন যখন তা ঠাণ্ডা হবে গরম করা হবে, সে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, যতক্ষণ না বান্দাদের ফয়সালা সমাপ্ত হয়"।[18]

যাকাতের রয়েছে দীনি, চারিত্রিক ও সামাজিক বহুবিধ উপকার। যেমন,

দীনি ফায়দা:

১. যাকাত ইসলামের এক বিশেষ রোকন, যার ওপর বান্দার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নির্ভর করে।

[18] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৭)

২. অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় যাকাত বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য প্রদান করে ও তার ঈমান বৃদ্ধি করে।

৩. যাকাত আদায়ের ফলে প্রভূত কল্যাণ লাভ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ ٢٧٦﴾ [البقرة: 276]

"আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন"। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৭৬] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩﴾ [الروم: 39]

"আর তোমরা যে সূদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলতঃ আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ প্রাপ্ত"। [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَن تصدَّق بعدل تمرة - أي: ما يعادل تمرة - من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فُلُوَّه حتى تكون مثل الجبل»

"হালাল উপার্জন থেকে যে খেজুর পরিমাণ সদকা করল, আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত গ্রহণ করেন না, আল্লাহ তা ডান হাতে গ্রহণ করেন, অতঃপর সদকাকারীর জন্য তা বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেমন তোমরা অশ্বশাবক লালন কর। অতঃপর পাহাড়ের ন্যায় পরিণত হয়"।[19]

৪. যাকাত দ্বারা আল্লাহ পাপসমূহ দূরীভূত করেন, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار»

[19] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪১০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০১৬।

“সদকা পাপ মোচন করে দেয়, যেমন পানি আগুন নির্বাপিত করে দেয়”।[20] এখানে সদকা দ্বারা উদ্দেশ্য যাকাত-নফল সদকা উভয়।

যাকাতের চারিত্রিক ফায়দা:

১. যাকাত ব্যক্তিকে দানশীল ও বদান্যদের কাতারে শামিল করে।

২. যাকাত প্রমাণ করে, যাকাত আদায়কারী অভাবীদের প্রতি রহম, দয়া ও অনুগ্রহশীল, আর আল্লাহ দয়াশীলদের ওপর দয়া করেন।

৩. আমাদের অভিজ্ঞতা যে, মুসলিমদের ওপর আর্থিক ও শারীরিক সেবা প্রদান অন্তঃকরণকে প্রশস্ত ও প্রফুল্ল করে এবং মানুষের নিকট যাকাত দাতাকে প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ করে তুলে।

---

[20] সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ২৬১৬, তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৯৩৭৩; মুসনাদে ইমাম আহদ: (৩/৩২১)।

৪. যাকাতে রয়েছে লোভ ও কৃপণতা থেকে মুক্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ١٠٣﴾ [التوبة: 103]

“তাদের সম্পদ থেকে সদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩]

যাকাতের সামাজিক উপকারিতা:

১. যাকাতের ফলে অভাবীদের অভাব দূর হয়, দুনিয়ার অধিকাংশ জায়গায় যাদের সংখ্যাই বেশি।

২. যাকাতের ফলে মুসলিমদের শক্তি অর্জন হয় ও তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কারণ, যাকাতের একটি খাত জিহাদ।

৩. যাকাত গরীবদের অন্তর থেকে ধনীদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করে দেয়। কারণ, গরীবরা যখন দেখে ধনীরা তাদের সম্পদ দ্বারা যাবতীয় প্রয়োজন পুরো করে, কিন্তু তাদের সম্পদ থেকে তারা কোনোভাবে উপকৃত হয়

না, এ কারণে অনেক সময় ধনীদের প্রতি তাদের অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষের জন্ম নেয়, যেহেতু ধনীরা তাদের অধিকার রক্ষা করে না, তাদের কোনো প্রয়োজনে তারা সাড়া দেয় না, কিন্তু ধনীরা যদি বছর শেষে গরীবদের যাকাত দেয়, তাহলে তাদের অন্তর থেকে এসব বিষয় দূরীভূত হয় এবং উভয় শ্রেণির মধ্যে মহব্বত ও ভালোবাসার সৃষ্টি হয়।

৪. যাকাতের ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পায় ও তাতে বরকত হয়। **যেমন**, হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«ما نقصت صدقة من مال»

“কোনো সদকা সম্পদ হ্রাস করে নি”।[21]

অর্থাৎ সদকার ফলে যদিও সম্পদের অংক কমে, কিন্তু তার বরকত ও ভবিষ্যতে তার বৃদ্ধি কমে না, বরং আল্লাহ

---

[21] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮৮; তিরমিযী, হাদীস নং ২০২৯; আমহদ: (৩/৩২১)।

তার সম্পদে বরকত দেন ও তার বিনিময়ে অধিক দান করেন।

৫. যাকাতের ফলে সম্পদে বরকত হয় ও তা বৃদ্ধি পায়। কারণ, সম্পদ যখন খরচ করা হয়, তখন তার পরিধি বৃদ্ধি পায় ও মানুষ উপকৃত হয়, ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও গরীবরা তা থেকে বঞ্চিত হলে যা হয় না।

অতএব, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় ব্যক্তি ও সমাজ বিনির্মাণে যাকাত অপরিহার্য।

যাকাত নির্দিষ্ট সম্পদের ওপর ওয়াজিব হয়, যেমন স্বর্ণ ও রূপা, শর্ত হচ্ছে এর নিসাব পূর্ণ হতে হবে। স্বর্ণের ক্ষেত্রে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ, আর রূপার ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার সমপরিমাণ অর্থের মালিক হলে যাকাত ওয়াজিব হবে। স্বর্ণ ও রূপা অলংকার বা যে অবস্থাতে থাক, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। অতএব, নারীর পরিধেয় অলংকারের ওপর যাকাত ওয়াজিব যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়, সে নিজে পরিধান করুক বা অন্যকে পরিধান করতে দিক। কারণ, দলীলের ব্যাপকতা

এটাই প্রমাণ করে। দ্বিতীয়তঃ কতক নির্দিষ্ট দলীল আছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অলংকারের ওপর যাকাত ওয়াজিব, যদিও তা ব্যবহারের হয়। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, জনৈক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করে, তার হাতে ছিল স্বর্ণের দু'টি চুড়ি, তিনি বললেন: "তুমি এগুলোর যাকাত দাও?"। সে বলল: না। তিনি বললেন: "তুমি কি পছন্দ কর আল্লাহ এগুলোর পরিবর্তে তোমাকে জাহান্নামের দু'টি চুড়ি পরিধান করান?। সে তা নিক্ষেপ করে বলল: এগুলো আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য।[22]

আরো যেসব জিনিসের ওপর যাকাত ওয়াজিব তন্মধ্যে রয়েছে: ব্যবসায়ী সম্পদ, অর্থাৎ ব্যবসার জন্য রক্ষিত সম্পদ যেমন জমিন, গাড়ি, চতুষ্পদ জন্তু ও অন্যান্য সম্পদ। এগুলোতে এক-দশমাংশের চার ভাগের এক

---

[22] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫৬৩; তিরমিযী, হাদীস নং ৬৩৭; নাসাঈ, হাদীস নং ২৪৭৯।

ভাগ যাকাত ওয়াজিব, অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের একভাগ। বছর শেষে হিসাব কষে তা বের করবে, তখন তার মূল্য কেনার দামের চেয়ে কম হোক অথবা বেশি হোক অথবা সমান সমান।

কিন্তু যেসব সম্পদ সে নিজের প্রয়োজন অথবা ভাড়া দেওয়ার জন্য রেখেছে, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুসলিমের ওপর তার গোলাম ও ঘোড়ার সদকা নেই"।[23] তবে ভাড়ার উপার্জনে যাকাত আসবে, যদি বছর পূর্ণ হয়।

অনুরূপভাবে স্বর্ণ বা রৌপ্যের অলঙ্কারেও যাকাত আসবে, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

---

[23] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৬৪; সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ৮।

সপ্তম অধ্যায়: যাকাতের হকদার প্রসঙ্গে

যাদের মধ্যে যাকাত বণ্টন করতে হবে, তারাই যাকাতের হকদার। আল্লাহ তা'আলা নিজে এদের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾ [سورة التوبة: 60]

"নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬০]

সুতরাং যাকাতের খাত আটটি:

১. ফকির: যাদের নিকট তাদের প্রয়োজনের অর্ধেকও নেই। বছরের ছয় মাস যে নিজের ও পরিবারের খরচের বহনে অক্ষম সেই ফকির। তার ও তার পরিবারের এক বছরের প্রয়োজন মোতাবেক তাকে যাকাত দেওয়া হবে।

২. মিসকিন: যাদের নিকট তাদের প্রয়োজনের অর্ধেক বা তার চেয়ে অধিক রয়েছে, কিন্তু পূর্ণ বছরের খোরাক নেই, এদেরকে যাকাত থেকে অবশিষ্ট বছরের খাদ্য দেওয়া যাবে।

যদি কোনো ব্যক্তির নিকট নগদ অর্থ নেই, কিন্তু তার অন্য উৎস অথবা চাকুরী অথবা সামর্থ রয়েছে, যা তার প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট, তাকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»

"ধনী ও কর্মঠ ব্যক্তিদের জন্য যাকাতে কোনো অংশ নেই"।[24]

৩. যাকাত উসুলে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ: যাদেরকে সরকার যাকাত উত্তোলন, যাকাত বিতরণ ও যাকাত সংরক্ষণের জন্য নিয়োগ দেয়, তাদেরকে তাদের কর্ম মোতাবেক যাকাত থেকে পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে, যদিও তারা ধনী হয়।

৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষ ব্যক্তিবর্গ: যারা কোনো সম্প্রদায়ের সরদার, যাদের ঈমান দুর্বল, তাদের ঈমানের দৃঢ়তা বৃদ্ধির জন্য যাকাত থেকে তাদেরকে দেওয়া যাবে, যেন তারা ইসলামের প্রতি আহ্বানকারী ও তার আদর্শ ব্যক্তিরূপে গড়ে উঠে। আর যদি দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি সরদার না হয়ে সাধারণ হয়, তার ঈমানের দৃঢ়তা বৃদ্ধির জন্য যাকাত দেওয়া যাবে কি-না?

---

[24] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৬৩৩; নাসাঈ, হাদীস নং ২৫৯৮; আহমদ: (৪/২২৪)।

কতক আলিম বলেন তাকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে, কারণ, দীনের স্বার্থ শরীরের স্বার্থের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ফকিরকে যখন তার শরীরের প্রয়োজনে খাদ্যরূপে যাকাত দেওয়া বৈধ, তাহলে তার অন্তরের খাদ্যরূপে ঈমান অধিক উপকারী। কতক আলিম বলেছেন তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না। কারণ, তার ঈমানের দৃঢ়তা বৃদ্ধিতে শুধু ব্যক্তি স্বার্থ বিদ্যমান, যা শুধু তার সাথেই খাস।

৫. গর্দান মুক্ত করা: অর্থাৎ যাকাতের অর্থে গোলাম খরিদ করা ও আযাদ করা, চুক্তিবদ্ধদের মুক্ত হতে সাহায্য করা এবং মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা।

৬. ঋণগ্রস্ত: যাদের নিকট তাদের ঋণ পরিশোধ করার অর্থ নেই, তাদের ঋণ পরিমাণ অর্থ কম/বেশি যাকাত থেকে দেওয়া যাবে, যদিও তাদের খাদ্যের অভাব না থাকে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি এমন হয়, যার নিজের ও পরিবারের খাদ্যের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ঋণ পরিশোধ

করার সামর্থ তার নেই, তাকে ঋণ পরিমাণ যাকাত দেওয়া যাবে; কিন্তু ঋণী ব্যক্তি থেকে ঋণ মৌকুফ করে যাকাতের নিয়ত করলে যাকাত শুদ্ধ হবে না।

যদি পিতা-মাতা অথবা সন্তান ঋণগ্রস্ত হয়, তাদেরকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে কি না, এ ব্যাপারে আলিমদের দ্বিমত রয়েছে। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তাদেরকে যাকাত দেওয়া বৈধ।

যাকাত আদায়কারী ঋণদাতার কাছে গিয়ে ঋণগ্রস্তের পক্ষ থেকে তার হক আদায় করে দিতে পারবে, যদিও ঋণগ্রস্ত তা না জানে। তবে শর্ত হচ্ছে যাকাত আদায়কারীকে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম।

৭. ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তা: অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য যাকাত দেওয়া যাবে। অতএব মুজাহিদদেরকে তাদের প্রয়োজন মোতাবেক যাকাতের অর্থ দেওয়া জায়েয। যাকাতের অর্থ দিয়ে জিহাদের অস্ত্র খরিদ করাও বৈধ।

আল্লাহর রাস্তার একটি হচ্ছে, শর'ঈ ইলম। সুতরাং শর'ঈ জ্ঞান অন্বেষণকারীকে তার প্রয়োজন মোতাবেক কিতাব ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য যাকাতের অর্থ দেওয়া বৈধ, তবে সে সচ্ছল হলে ভিন্ন কথা।

৮. ইবন সাবিল: অর্থাৎ মুসাফির, যার পথ খরচ শেষ হয়ে গেছে, তাকে যাকাত থেকে বাড়িতে পৌঁছার অর্থ দেওয়া যাবে।

এরা সবাই যাকাতের খাত ও হকদার। আল্লাহ স্বয়ং কুরআনে এদের উল্লেখ করেছেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরয, যা তিনি স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে তার বান্দাদের ওপর ফরয করেছেন।

এ খাতসমূহ ব্যতীত অন্য কোনো খাতে যাকাত ব্যয় করা যাবে না। যেমন, মসজিদ নির্মাণ অথবা রাস্তাঘাট তৈরি বা মেরামত। কেননা আল্লাহ যাকাতের খাত সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নির্দিষ্ট করার পরার পর তা আর অনির্দিষ্ট খাতে দেওয়া যায় না।

আমরা যাকাতের এসব খাত নিয়ে চিন্তা করলে দেখতে পাই, এদের কেউ যাকাতের মুখাপেক্ষী, আবার কেউ আছে যার মুখাপেক্ষী মুসলিম উম্মাহ। এখান থেকে আমরা যাকাত ওয়াজিবের হিকমত বুঝতে পারি। অর্থাৎ এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সুশৃঙ্খল ও সুন্দর সমাজ গঠন করা। ইসলাম সম্পদ ও সম্পদের ওপর ভিত্তি-করা স্বার্থকে গৌণভাবে দেখে নি। আবার ইসলাম লোভী, কৃপণ আত্মাকে তার প্রবৃত্তি ও কৃপণতার ওপর ছেড়ে দেয় নি, বরং ইসলাম হচ্ছে, সর্বোত্তম কল্যাণের পথ-প্রদর্শক এবং জাতিসমূহের সর্বোৎকৃষ্ট সংশোধনকারী।

অষ্টম অধ্যায়: যাকাতুল ফিতর প্রসঙ্গে

যাকাতুল ফিতর ফরয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান শেষে ঈদুল ফিতরের সময় তা ফরয করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم الفطر من رمضان على العبد والحر والذكر والأُنثى والصغير والكبير من المسلمين»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলাম, স্বাধীন, পুরুষ, নারী, ছোট-বড় সকল মুসলিমের ওপর সদকাতুল ফিতর ফরয করেছেন”।[25]

সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ এক ‘সা’, দেশের প্রচলিত খাদ্য থেকে তা পরিশোধ করতে হবে। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم صاعًا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر».

[25] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫১১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৪)

“আমরা ঈদুল ফিতরের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ‘সা’ খাদ্য প্রদান করতাম, তখন আমাদের খাদ্য ছিল গম, কিশমিশ, পনির ও খেজুর”।[26]

অতএব, টাকা, বিছানা, পোশাক ও জীব জন্তুর খাদ্য দ্বারা সদকাতুল ফিতর আদায় হবে না। কারণ, এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিপরীত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»

“যে এমন আমল করল, যার ওপর আমাদের আদর্শ নেই তা পরিত্যক্ত”।[27]

---

[26] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫১০।

[27] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০, ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৮; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৪; আহমদ: (২/১৪৬)।

এক ‘সা’ এর পরিমাণ হচ্ছে, দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম ভালো গম। এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘সা’, যার দ্বারা তিনি সদকাতুল ফিতর নির্ধারণ করেছেন।

ঈদের সালাতের আগে সদকাতুল ফিতর বের করা ওয়াজিব, তবে উত্তম হচ্ছে ঈদের দিন সালাতের পূর্বে সদকাতুল ফিতর আদায় করা। ঈদের একদিন বা দু’দিন পূর্বেও দেওয়া আদায় করা বৈধ। সালাতের পরে দিলে আদায় হবে না। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

«أن النبي صلى الله عليه وسلّم: «فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “বেহুদা ও অশ্লীলতা থেকে সাওমকে পবিত্র করা ও মিসকিনদের খাদ্য স্বরূপ সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছেন। যে তা সালাতের পূর্বে আদায় করল, সেটাই গ্রহণযোগ্য সদকা, আর যে

তা সালাতের পরে আদায় করল, সেটা অন্যান্য সদকার ন্যায় সাধারণ সদকা”।[28]

আর যদি কেউ ঈদের সালাত শেষ হয়ে যাওয়ার পর ঈদ সম্পর্কে জানতে পারে অথবা সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় মরুভূমিতে থাকে অথবা এমন জায়গায় থাকে যেখানে সদকা গ্রহণ করার কেউ নেই, তাহলে সুযোগ মত আদায় করলেই হবে। আল্লাহ ভালো জানেন।

আর আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ ও তার পরিবার ও সাহাবীদের ওপর দুরূদ ও সালাম পাঠান।

সমাপ্ত

---

[28] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৬০৯; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৮২৭; হাকেম: (১/৪০৯), হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী তার সমর্থন করেছেন।

বরকতময় মাস রমযানের আগমন উপলক্ষে মুসলিম ভাইদের নিকট ‘সিয়াম, তারাবীহ ও যাকাত বিষয়ে কয়েকটি অধ্যায়’ কিতাবটিতে সিয়ামের হুকুম, সিয়ামের হিকমত ও ফায়দা, মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তিদের সাওম, সাওম ভঙ্গের কারণসমূহ, তারাবীহ, যাকাত ও তার উপকারিতা, যাকাতের হকদার ও যাকাতুল ফিতর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।